শারীরিক শাস্তিরোধে ইতিবাচক শৃঙ্খলার ভূমিকা

ফ্লোরা জেসমিন

বাংলাদেশে বহু শিশু বাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তিকে জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, শৃঙ্খলা শেখার একটি অংশ হিসেবেই বিবেচনা করে, যদিও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবরকম শারীরিক শাস্তিকে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করেছে।

বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তির প্রচলন কম-বেশি সব জায়গায়ই দেখা যায় এবং শিশুকে শৃঙ্খলা শেখানোর জন্য শারীরিক শাস্তি অভিভাবকদের কাছেও গ্রহণযোগ্য, যদিও শারীরিক শাস্তি শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়াকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

শারীরিক শাস্তিকে নিষিদ্ধ করার পরও, ২০১৩ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার তারাশ উপজেলার গুলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষকের হাতে ১৫০ জন শিশু শারীরিক শাস্তির বা মারধরের শিকার হয়। এদের মধ্যে ৩০ জন শিশু আঘাতের জন্য ক্লাসে উপস্থিত হতে পারেনি। ২০১৩ সালের জুন মাসে জামালপুরের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হয় এবং একই বছর জয়পুরহাটের একজন শিক্ষকের প্রহারের কারণে এক ছাত্রের হাত ভেঙ্গে যায়।

স্কুলে দেওয়া উল্লেখযোগ্য শারীরিক শাস্তির মধ্যে আছে বকা দেওয়া, লাঠি বা বেত দিয়ে আঘাত করা, ক্লাসে বা বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখা, নিল ডাউন করিয়ে রাখা, শরীরের অন্যান্য জায়গায় আঘাত করা, কিল-ঘুসি-চড় মারা, চুল এবং কান ধরে টান দেওয়া ও চিমটি কাটা।

বাংলাদেশের শহর, গ্রামাঞ্চল, বস্তি এলাকা, চর এলাকা, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা থেকে মোট ৩,৮৪০টি পরিবারকে নমুনা হিসেবে নিয়ে ইউনিসেফ পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ৯১ ভাগ শিশু ক্লাসরুম বা বিদ্যালয়ে কখনও না কখনও শারীরিক শাস্তির শিকার হয়। তবে শাস্তির প্রকারভেদ এবং মাত্রা অনেকটাই নির্ভর করে বয়স, লিঙ্গ এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উপরে। ১৪-১৮ বছর বয়সী মেয়েরা বিদ্যালয়ে সবচেয়ে কম এবং ৯-১৩ বছরের বালকরা সবচেয়ে বেশি শারীরিক শাস্তি পায়। এই গবেষণায় জানা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আয়ের (Household income) সঙ্গে শারীরিক শাস্তির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে দারিদ্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি এবং শিক্ষার হার কম সেখানে শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের হারও বেশি। (Children's Opinion Poll 2008, Dhaka: UNICEF & Ministry of Women and Children Affairs)

শতকরা ৯৯.৩ ভাগ শিশু বাড়িতে তাদের মা-বাবা ও পরিবারের কাছ থেকে নিয়মিত মৌখিক নির্যাতন এবং গালিগালাজ বা হুমকি পেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ বলে, তারা বাড়িতে নিয়মিত শারীরিক শাস্তি পায়, ৭০ শতাংশ চড়-থাপ্পড় খেয়ে থাকে, ৪০ শতাংশ নিয়মিত মার বা লাথি খায়। (UNICEF (2009) Opinions of Children of Bangladesh on Corporal Punishment: Children's Opinion Poll 2008, Dhaka: UNICEF & Ministry of Women and Children Affairs)

একত্রিশ শতাংশ বিদ্যালয়গামী শিশু জানায়, এই গবেষণার আগের সপ্তাহে তারা তাদের স্কুলে শারীরিক শাস্তি পেয়েছে। একচল্লিশ শতাংশ

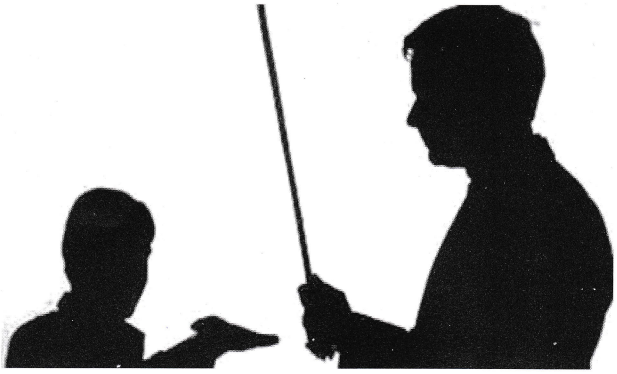

শিশু জানায়, তারা দুর্বল ক্লাস পারফরমেন্স-এর জন্য শারীরিক শাস্তি পেয়েছে, ৩৪ শতাংশ শারীরিক শাস্তির কারণ জানায়নি, ৫ শতাংশ ক্লাসে অনুপস্থিতির জন্য শাস্তি পেয়েছে। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ বেতের বাড়ি এবং ২৪ শতাংশ অন্যান্য শাস্তি বা মারধরের শিকার হয়। (Save The Children in Bangladesh, Mapping & Situation Analysis Report, 2013)

প্রতিবছর সারা বিশ্বে আনুমানিক প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৬ জন (যাদের বয়সসীমা ২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে) তাদের পরিচর্যাকারীদের (বাবা-মা, শিক্ষক, পরিবার) হাতে শারীরিক শাস্তি পেয়ে থাকে। উৎস: *United Nations Children's Fund Hidden plain Sight – A Statistical analysis of violence against Children, UNICEF September 2014.*

সাধারণ মানুষ মনে করে, শিশুকে শৃঙ্খলা বা আদব-কায়দা শেখানোর জন্য শারীরিক শাস্তি খুব কার্যকর, এটা প্রয়োগ করে সহজেই শিশুকে শেখানো যায় এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, শিশুরা তাদের অভিভাবকদের সহজেই সন্তুষ্ট করতে পারে, শিশুদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করা যায় এবং সামাজিক নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ শিশু সহজেই আয়ত্ব করতে পারে। বিকল্প আর কিছু জানা না থাকার কারণেও অভিভাবকরা শিশুকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকে।

আসলেই কি শিশুকে শেখাতে শারীরিক শাস্তি কার্যকর?

বহু গবেষণা এটা নিশ্চিত করেছে যে শারীরিক শাস্তি শিশুর উপর সম্পূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটা শিশুকে শৃঙ্খলা শিখতেও সহায়তা করে না।

শারীরিক শাস্তির বাস্তব প্রভাব

প্রথমত, শারীরিক শাস্তি শিশুকে হেয় প্রতিপণ্ন করে তার মধ্যে অসহায়ত্ব এবং অবমাননার অনুভূতি উদ্রেক করে, শিশুর আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধকে দুমড়ে-মুচড়ে তাকে আক্রমণাত্মক অথবা নিজেকে গুটিয়েফেলার মতো মানসিক অবস্থায় নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, শারীরিক শাস্তি অভিভাবকের ওপর শিশুর বিশ্বাস নষ্ট করে দেয় এবং শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এটা শিশুর আক্রমণাত্মক বা অপরাধমূলক আচরণ মোটেই কমায় না, বরং এটা শিশুর জ্ঞানগত বিকাশকে (শিক্ষণ, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, সামাজিক দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের কৌশল) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এ

ধরনের শিশুরা স্কুলের ফলাফলে অন্যান্য শিশুর চেয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে।

শারীরিক শাস্তি সবসময় শিশুকে এই বার্তা দেয় যে নির্যাতন বা আক্রমণাত্মক আচরণই হলো সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। এটা আসলে শিশুর মনে নীরব রক্তক্ষরণ ঘটাতে থাকে, যা শিশুর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ কমাতে থাকে, এমনকি এটা তার জন্য তীব্র পর্যায়ের মানসিক ট্রমা হতে পারে। এছাড়াও রয়েছে এর মনোসামাজিক প্রভাব, যেমন স্কুল থেকে ঝরে পড়া, দীর্ঘমেয়াদি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বিষণ্নতা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং মাদক সেবন।

শিশুকে মারধর করার আগে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করা দরকার

- শিশুর অগ্রহণযোগ্য আচরণের পেছনে কোন সুপ্ত বা গোপন কারণ থাকতে পারে। সেই সুপ্ত বা গোপন কারণটি উদ্ঘাটন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।
- এটা প্রত্যাশা না করা যে একটি শিশু একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মতো আচরণ করবে।
- শিশুরা যে অন্যদের মতো ভুল করতে পারে তা স্বীকার করা। শিশুর অগ্রহণযোগ্য আচরণকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে তাকে গ্রহণযোগ্য আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া।
- যদি আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে শিশু নেতিবাচক কোন আচরণ করে তবে তাকে সাহস দেয়া।
- শিশুর ব্যক্তিত্বের চেয়ে শিশুর আচরণের দিকে বেশি মনোযোগী হওয়া। যেমন শিশুকে এ কথা না বলা, "তুমি একটা বাজে ছেলে/মেয়ে বলে এই কাজটা করতে পারলে।" এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, "তুমি যে কাজটা করেছ সেটা একটা বাজে কাজ।"
- শিশুকে সংশোধন করার জন্য তার অগ্রহণযোগ্য আচরণের উপর আলোকপাত না করা, বরং তার বিপরীত যে প্রত্যাশিত আচরণ রয়েছে সেটা শিশুর মধ্যে বিকশিত করা। যেমন যে শিশু একটি বিড়াল ছানাকে খোঁচাখুঁচি করে সেই শিশুটিকে বিড়াল ছানাকে ভালবাসতে শিখানো।

ইতিবাচক শৃঙ্খলা

ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো নির্যাতনবিহীন বা শাস্তিহীন ও সম্মানজনকভাবে শিশুকে শেখানো। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে এবং জীবনে সফলকাম হতে সহায়তা করে।

ইতিবাচক শৃঙ্খলা যা নয়

- ইতিবাচক শৃঙ্খলা এমন নয় যে বাবা-মা সব কিছু করার অনুমতি দেবে;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা এমন নয় যে সন্তান যা চাইবে তাকে তাই করতে দেওয়া ;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা এমন নয় যে সেখানে কোন নিয়মনীতি, সীমারেখা বা প্রত্যাশা থাকবে না;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা এমন নয় যে এটি কোন আচরণের প্রতি ক্ষণিকের প্রতিক্রিয়া অথবা থাপ্পড় বা আঘাত করার মতো শাস্তির বিকল্প।

ইতিবাচক শৃঙ্খলা হচ্ছে

- ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান, যা শিশুকে স্ব-শৃঙ্খলা শেখায়;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো শিশুকে আপনার প্রত্যাশা, নিয়মনীতি এবং সীমারেখা স্পষ্টভাবে জানানো;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো আপনার সন্তানের সাথে আপনার একটি পারস্পরিক সম্মানজনক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো আপনার সন্তানকে জীবনব্যাপী কার্যকর ও প্রয়োজন এমন দক্ষতা শেখানো;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো যে কোন কঠিন চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আপনার সন্তানের যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা;
- ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো সৌজন্য, অহিংসা, সহমর্মিতা, আত্মসম্মান, মানবাধিকার এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানো।

ইতিবাচক শৃঙ্খলার চারটি স্পষ্ট মূলনীতি রয়েছে। মা-বাবা বা অভিভাবক শিখবেন কীভাবে: (১) লক্ষ-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন, (২) বাড়িতে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবেন, (৩) শিশুরা কীভাবে চিন্তা ও অনুভব করে তা উপলব্ধি করবেন এবং (৪) চ্যালেঞ্জিং বা কঠিন পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করবেন। তারা তাদের দক্ষতার বাস্তব অনুশীলন করবেন।

ইতিবাচক শৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্য:

- ইতিবাচক শৃঙ্খলায় কখনও সহিংসতা, শাস্তি ও অপমানজনক কোন বিষয় থাকে না।
- শিশুর চেয়ে তার কাজকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিকল্প আচরণ করতে উৎসাহিত করা হয়।
- ভ্রান্ত আচরণগুলো নিয়ে কাজ করে এবং সাথে সাথে শিশুদের ইতিবাচক শিক্ষণকে উৎসাহিত করে।
- এটা শিশুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না।
- এটা সবসময়ই সুচিন্তিত ও পরিকল্পনামাফিক হয়ে থাকে।
- কোন ঘটনার প্রভাব ও আদর্শগুলি জানানো হয়।
- আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষণ সম্পন্ন হয়, শিশুরা শ্রেণীকাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।
- শারীরিক, মানসিক ও আবেগীয় বিকাশে সহায়ক।
- ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল হয়, শিশুরা নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।
- যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ে (যেমন শোনা, প্রকাশ করা, ক্ষমা করা)।
- সমঝোতার দক্ষতা বাড়ে।
- শিশুদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ে।
- বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা বাড়ে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Positive Discipline: Joan. E. Durrant

Positive Discipline Techniques to promote positive Behavior in Children: Save the Children

ডেপুটি ম্যানেজার, চাইল্ড প্রোটেকশন
সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ